সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিশ শতকের একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি। ইংরেজি ‘genius’ শব্দে অলৌকিকের যে-আভাস আছে, তা স্বীকার্য হলে প্রতিভা এক ধরনের আবেশ। সংস্কৃত ‘প্রতিভা’ শব্দের আক্ষরিক অর্থ অনুসারে তা হবে বুদ্ধিদীপ্ত মেধার নামান্তর। বাংলা কাব্যে সুধীন্দ্রনাথ সেই বুদ্ধিদীপ্ত মেধা। অথচ প্রতিভার প্রাচুর্য নিয়ে সুধীন দত্ত গভীর নিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন কবিতা রচনার কর্মযজ্ঞে। তিনি ছিলেন বহু ভাষাবিদ, পন্ডিত ও মনস্বী, তীব্র বিশ্লেষণী বুদ্ধির অধিকারী, তত্ত্বে আসক্ত, দর্শনে ও সংলগ্ন শাস্ত্রসমূহে বিদ্বান। তাঁর পঠনের পরিধি ছিল বিরাট – এবং বোধের ক্ষিপ্রতা বুদ্ধির সীমা অতিক্রান্ত ও অসামান্য। তাঁর কান্ডজ্ঞান, সাংসারিক ও সামাজিক সুবুদ্ধি, আলাপদক্ষ, রসিক, প্রখর ব্যক্তিত্বশালী পরিপূর্ণ মনীষা – সবকিছুই হয়েছে কবিত্বের অনুষঙ্গ।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা মূলত এক বিরামহীন মল্লযুদ্ধ; নিরন্তর সংগ্রাম-ভাবনার সঙ্গে ভাষার, ভাষার সঙ্গে ছন্দ, মিল এবং ধ্বনিমাধুর্যের। ‘শ্রীশ্রী দুর্গামাতা সহায়’ – বলে অসাধারণ নিষ্ঠা নিয়ে তিনি কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। বুদ্ধি দ্বারা আদিষ্ট পরিশ্রমী সুধীন দত্ত অতি ধীরে সাহিত্যের পথে অগ্রসর হলেন – সুচিন্তিতভাবে, গভীরতম শ্রদ্ধা ও বিনয়ের সঙ্গে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও কাজী নজরুল ইসলামের মতো সুধীন দত্ত কবি হয়ে ওঠেন অস্বাভাবিক পথে। অগ্রজদের শিথিল ও অতিভাষী বাংলা কবিতাকে অভাবনীয় সংহতি ও দার্ঢ্য প্রদান তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্য, নজরুলের ‘বিদ্রোহী’ আর সুধীন দত্তের ‘অর্কেস্ট্রা’ বাংলা কবিতার ইতিহাসে বিষয় ও বিন্যাসে দিয়েছে নতুনত্বের সন্ধান। তাঁর কবিতার বিষয়বস্ত্ত জীবনের মৌল সত্য-প্রেম, কাল, ভগবান প্রভৃতির অনুসন্ধান।

সুধীন্দ্রনাথ ১৯২৯ সালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জাপান ও আমেরিকা সফর করেন, পরে একা ইউরোপ ভ্রমণে যান। সারা বছরের এই বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা পরবর্তীকালে তাঁর কাব্যের মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন আনে। ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের সবচেয়ে সৃষ্টিশীল পর্যায় আরম্ভ; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত তাঁর অপর সীমানা। ১৯৩০-৪০; এই দশ বছর তাঁর অধিকাংশ প্রধান রচনার জন্মকাল। প্রায় সমগ্র 'অর্কেস্ট্রা' (১৯৩৫), 'ক্রন্দসী'(১৯৩৭), 'উত্তর ফাল্গুনী'(১৯৪০), প্রায় সমগ্র 'সংবর্ত'(১৯৫৩), সমগ্র কাব্য ও গদ্য 'স্বগত', 'কুলায় ও কাল পুরুষে'র প্রবন্ধাবলি – এই একটি মাত্র দশকের মধ্যে তিনি সমাপ্ত করেন। তাঁর সম্পাদিত 'পরিচয়' পত্রিকার সবচেয়ে প্রোজ্জ্বল পর্যায়, ১৯৩১-৩৬ – তাও এই অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও মোহিতলাল মজুমদার – এই তিনজন কবির ঠান্ডা উপস্থিতি সুধীন দত্ত তাঁর কাব্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। উনিশ শতকী মনোপ্রসাদে ধনী, মহাকবি মাইকেলের কবিতা বর্ণনাধর্মী। অন্যপক্ষে সুধীন দত্তের কবিতা সময় স্বভাবের প্রভাবে ব্যঞ্জনাবীথি ছড়ানো এবং ভবঘুরে গীতিকবিতার স্বপ্নদ্রষ্টা। তবু দুই দত্তজ কবির মধ্যে কিছু ঐক্য রয়েছে :

এক. বহিরঙ্গে কঠিন, সংবৃত, সংস্কৃত শব্দের ব্যবহারে, যত্নকৃত যতিচিহ্নের উপস্থাপন ও গঠনের নিবিড় জ্যামিতিতে।

দুই. অন্তরঙ্গে – দুজনই আত্মজড়িত, মানসিক জর্জরিত দ্বৈরথ সমরে দুই বিক্ষুব্ধ সন্তান, এক অপ্রতিকার্য নিয়ত চৈতন্যের পুত্র;

-ব্যক্তিজীবনে পার্থক্য আছে, কিন্তু মনোজীবনে সন্দেহ আর সংরাগে অনন্য। সুধীন দত্ত আধুনিক কুশল মানুষের মতোই ভদ্রলোকিত্বের ইস্ত্রিকরা পোশাকের তলায় প্রাণপণে ঢেকে রাখতেন অন্তর্জগৎ। কবির সন্দেহ, অসুখ, বিবেক, অপ্রেম, চিৎকার, স্মৃতিকষ্ট আর সর্বোপরি লোকোত্তর তাড়না; যার দেহ থেকে রবীন্দ্রনাথের মতো ঈশ্বরকে উচ্ছিন্ন করা যায় না। অন্তর্জগৎ জুড়ে লুকিয়ে থাকতেন রবীন্দ্রনাথ। ঈশ্বর থেকেই যান কবির চৈতন্যের অলিগলির বিপদগুআপদে। মাইকেলের ‘প্রাক্তন’ই সুধীন দত্তের গুরুতর ‘ভবিতব্য’। সুধীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রছায়ায় লালিত মানুষ। স্বাভাবিকভাবে তাঁর প্রভাব থাকবেই। প্রথম প্রথম অনুকরণও করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে। সুধীন দত্তের মনোভাব ও গঠনের ক্ল্যাসিক ঐতিহ্যের অন্তরালে রোমান্টিক উজ্জীবনের স্বতঃপ্রকাশ। তাঁর কাব্যে সারাজীবন ব্যক্তিগত তমসা ও আভার উচ্চারণ ও চিৎকার রোমান্টিকতারই বংশলক্ষণ।

কবি মোহিতলাল মজুমদারের কিছু পরোক্ষ প্রভাব আছে সুধীন দত্তে। যা দেখা যায় শব্দ-ব্যবহারে, বাক্যগঠনে, বুদ্ধিবাদে, দেহধর্মিতায় ও কাব্যদর্শনের স্বরূপের আরোপে। তবে কবির বুদ্ধিবাদ, দেহধর্ম ও কাব্যদর্শনের স্বরূপের আরোপ মোহিতলাল থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মোহিতলাল অর্থে তিনি দেহবাদী নন; গভীরভাবে তিনি আধ্যাত্মিক। হয়তো ‘বৈনাশিক কালে’র দুই কালো হাত থেকে সাময়িক উদ্ধার পাওয়ার জন্য দেহের আশ্রয়ে শান্তি ও মুক্তি পেতে চেয়েছিলেন মাত্র। তাঁর দেহসম্ভোগ স্মৃতির ভেতর দিয়ে রচিত। মোহিতলালের দেহধর্মের আস্থা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াজাত। স্বদেশের

বাইরে সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন ‘মালার্মে’র ভীষণ ভক্ত ও অনুরাগী। মালার্মে ছাড়াও তাঁর দুই স্বনামধন্য শিষ্য ‘পোলভালেরি’ ও ‘মার্সেল প্রুস্তে’র সঙ্গে সুধীন বাবুর কাব্যসখ্য ছিল। বিশেষ করে ‘মালার্মে’র শিষ্য পোলভালেরির সঙ্গে সুধীন দত্তের ঐক্য পরিলক্ষিত।

এই ঐক্য রোমান্টিক মনোবৃত্তি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট অবজ্ঞা, নিরুত্তেজ আবেগ, ক্ল্যাসিক বৈদগ্ধ্য, চৈতন্যের সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস ও নৈরাশ্যকে সম্ভ্রান্ত সাহসে গ্রহণের মধ্যে। ‘ধ্রুবপদ’ গঠনে ফরাসি কবিতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ লক্ষণীয়। তবে সুধীন দত্তে রোমান্টিক অবজ্ঞার অন্তরালে রোমান্টিক আকর্ষণই প্রকাশিত :

"একটি কথার দ্বিধা থর থর চুড়ে
ভর করেছিলে সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চিরচঞ্চল গতি;" (‘শাশ্বতী’, অর্কেস্ট্রা)

১৯৩৫ সালে প্রকাশিত **'অর্কেস্ট্রা'** সুধীন দত্তের পূর্ণাঙ্গ আকারে বহুলাঙ্গে পরিণত কাব্য। অর্কেস্ট্রা প্রেমবিরহের কাব্য। কিন্তু এ প্রেম ও বিরহের সঙ্গে বাংলা কাব্যের চিরাচরিত ধারার ব্যবধান বিরাট। পুরনো অথচ চিরনতুন প্রেমের বিষয়কে তিনি সম্পূর্ণ নতুন মূল্যবোধে উপস্থাপন করে বাংলা সাহিত্যে প্রেমবিরহের এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছেন, যার প্রকাশ অপূর্ব ও অনন্য। আধুনিক প্রেমের অবিশ্বাস, সন্দেহ, ছলনার মায়াজাল এবং ক্ষণবাদিতার এক অনন্য প্রকাশ হয়ে উঠল তাঁর কবিতা। রবীন্দ্রনাথের সুখদা, কল্যাণী, শাশ্বতীর বিরুদ্ধে তিনি প্রথম কবিতাতেই দাঁড় করালেন নিজস্ব নায়িকা ‘ক্ষণিকা’কে। এখানে পাঠক তাঁর ক্ষণিক, রঙিন, আধুনিক প্রেমের সঙ্গে পরিচিত হলো -

"মোদের ক্ষণিক প্রেম স্থান পাবে ক্ষণিকের গানে
স্থান পাবে হে ক্ষণিকা, শ্লথনীবি যৌবন তোমার :
বক্ষের যুগল স্বর্গে ক্ষণতরে দিলে অধিকার;
আজি আর ফিরিব না শাশ্বতের নিষ্ফল সন্ধানে।" (‘হৈমন্তী’, অর্কেস্ট্রা)

-এ-কাব্যগ্রন্থেই প্রথম দেখা গেল আধুনিক প্রেম ও তার বহুস্তর দ্বন্দ্বপীড়িত আত্মা। ক্ষণিকতা, প্রেমের অপ্রিয় সত্য সম্বন্ধে জ্ঞান ও স্পষ্ট কথন -

"অসম্ভব, প্রিয়তমে, অসম্ভব শাশ্বত স্মরণ;
অসংগত চির প্রেম; সংবরণ অসাধ্য অন্যায়;" (‘মহাসত্য’, অর্কেস্ট্রা)

-কবির প্রেমিকও একদিন চলে যাবে অপরের কাছে ‘কিন্তু সে আজ আর কারে ভালোবাসে।’ মর্মান্তিক এ-সত্য কবি জানেন, এজন্য কবির মতো দুঃখী কেউ নেই। কবির প্রেয়সী তো আধুনিকা : সে পূর্বে ছিল অন্য কারো প্রেমিকা, ভবিষ্যতেও সে অপরের হৃদয়াসনে বিরাজ করবে; শুধু মধ্যবর্তী কোনো এক সময়ে সে ও কবি ভরে উঠেছিল ভালোবাসায় -

"ভেবো না, ভেবো না, সখী; স্বপ্ন দুঃস্থ দীর্ঘ রাত্রি শেষে
বসন্ত অন্তরে তব আরম্ভিবে পুন চতুরালি :
নবীন ফাল্গুনী আসি হানা দিবে রুদ্ধদ্বার দেশে;
ফলিবে মানস ক্ষেত্রে বর্ষে বর্ষে সোনার চৈতালি।
ক্ষণিক ইন্দ্রত্ব লভি অনায়াস তপস্যার ফলে,
তোমার উরস স্বর্গে বিরাজিবে বহু মর্ত্যচর," (‘ভবিতব্য’, অর্কেস্ট্রা)

‘অর্কেস্ট্রা'র ‘সঞ্চয়',' সর্বনাশ’ কবিতায় ব্যক্ত প্রিয়তমার অতীতের কথা; ‘ভবিতব্য’, ‘শাশ্বতী’ ইত্যাদিতে তাঁর ভবিষ্যতের চিত্র। কবির কাছে অতীত অন্ধকার, ভবিষ্যৎ মৃত। প্রেমের বহুস্তর মনোভাবের ফলেই প্রিয়াকে কবির কখনো মনে হয় ‘ছলনাময়ী’, কখনো ‘প্রলুব্ধ ছায়াময়ী’। কবি-প্রেমিকার অতীত ও ভবিষ্যৎ জীবন কোনোটাই কবির পক্ষে সুখের নয়, আবার একমাত্র বর্তমানও অপাপবিদ্ধ নয় -

‘জানি অলজ্জিত রাতে, শ্লথনীবি কম্প্র আত্মদানে
দেয়নি সে মোরে অর্ঘ্য, খুঁজেছিল বসন্ত সখাকে।’ (‘জিজ্ঞাসা’, অর্কেস্ট্রা)

-স্মৃতির ভেতর বর্তমানও অকপট ভালোবাসায় ভরা নয়। এ-মর্মান্তিক রূঢ় ও বদমাশসত্যকে যিনি জানেন, তিনি দার্শনিক বটে; কিন্তু তাঁর পক্ষে শান্তি দুরাশারই নামান্তর। মূলকথা – যার চোখ মঞ্জুল প্রতিমা ভেদ করে ভেতরে কাঠখড় আবর্জনা দেখতে পায়, মোহিনী নারীর ভেতর দেখে শুধু কঙ্কাল, তিনি অসুখী। সত্যের উপরিস্তর তাকে ভোলাতে অসমর্থ। সুধীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টির রঞ্জনরশ্মি এক নিরুত্তর সত্যের মর্মে গিয়ে বিঁধে। তবু বর্তমানতায় মগ্ন ক্ষণিকাকে উদ্দেশ করে বলেন -

"চাই চাই, আজও চাই তোমারে কেবলই,

আজও বলি,
জন শূন্যতার কানে রুদ্ধ কণ্ঠে বলি, আজও বলি-
অভাবে তোমার
অসহ্য অধুনা মোর, ভবিষ্যৎ বদ্ধ অন্ধকার
কাম্য শুধু স্থবির মরণ।
নিশার অসীমে আজও নিরপেক্ষ তব আকর্ষণ
লক্ষ্যহীন বৃক্ষে মোরে বন্দী করে রেখেছে, প্রেয়সী;
গতি অবসন্ন চোখে উঠিছে বিকশি
অতিতের প্রতিভাস জোতিষ্কের নিঃসার নির্মোকে।
আমার জাগর স্বপ্নলোকে
একমাত্র সত্তাতুমি, সত্য শুধু তোমারই স্মরণ।" (‘নাম’, অর্কেস্ট্রা)

-প্রেমের দ্বিধা, রহিত আনন্দ কবি একেবারে পাননি তা নয়, ‘মূর্তিপূজা,’ ‘পুনর্জন্ম,’ ‘অনুষঙ্গ,’ ‘মহাশ্বেতা’ ইত্যাদি কবিতায় তা মূর্তমান। তাঁর ভালোবাসার শ্রেষ্ঠ ফসল ‘শাশ্বতী’ কবিতা। এখানে যদিও তাঁর নায়িকা ‘আজ আর কারে ভালোবাসে’ তবু কবির সিদ্ধান্ত -

‘সে ভোলে, ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।’

-এই পরম উদাত্ত ঘোষণায় প্রেমের বিজয়স্তম্ভ আকাশ স্পর্শ করেছে। এক কথায় কবিতাটি অনির্বচনীয়। এটি আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা। অর্কেস্ট্রা কাব্যগ্রন্থে কবি শাশ্বত মূল্যবোধ সম্বন্ধে স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যকে জীবন ও জগতের স্মারক করেছেন -

"তবু রবে অন্তশীল স্বপ্রতিষ্ঠ চৈতন্যের তলে
হিতবুদ্ধি হন্তারক ক্ষণিকের এ আত্মবিস্মৃতি;
তোমারই বিমূর্ত প্রশ্ন জীবনের নিশীথ বিরলে
প্রমাণিবে মূল্যহীন আজন্মের সঞ্চিত সুকৃতি।" (‘মহাসত্য’, অর্কেস্ট্রা)

'অর্কেস্ট্রা'র পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ **'ক্রন্দসী'** – ১৯৩৭ সালে প্রকাশিত। এখানে আধুনিক কালের অবক্ষয়, উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত ধর্ম ও বিশ্বাসের প্রতি কবির তীব্র সংশয় এবং অস্থির আত্মপরিক্রমার যন্ত্রণা রূপ লাভ করেছে। ক্রন্দসী আবহমান বাংলা কাব্যে বড্ড বেশি রকমের নতুন। ভাবনায় বেদনায় অভিনব বলতে ইচ্ছে করে। ইতোপূর্বে ‘আরো এক বিপন্ন বিস্ময়ে’র কথা অনেকে ভেবেছেন। কিন্তু প্রকাশের এই দুঃসহ, স্পষ্ট ও কুসংস্কারমুক্ত পথ খুলে দেওয়ার জন্য ভাবীকালের প্রাতঃস্মরণীয় দণ্ডায়মান পুরুষ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। ক্রন্দসীতে প্রথম দেখা দিলো শতবিচিত্র জীবনের নিঃসার পথ পরিক্রমা – দেখা গেল –

‘ধূ ধূ করে মরুভূমি;
ক্ষয়ে ক্ষয়ে ছায়া মরে গেছে পদতলে।’

-আর এই মরুভূমিতে ব্যক্তির হৃৎপদ্মের সব আলোক ও নীলিমা নিভে গেল : প্রেম আত্মপ্রবঞ্চনা, কাল ক্ষুৎকাতর, বিদ্রোহ স্বাতন্ত্র্যরহিত, মুক্তিমানে নিরুপায় ক্ষমা, ভগবান শুধু রিক্ত নাম ও লুপ্ত বংশকুলীনের কল্পিত। সুধীন্দ্রনাথের নাস্তি দর্শন অর্কেস্ট্রায় ছিল শুধু প্রেমকে অবলম্বন করে। ক্রন্দসীতে বিশ্বসংসারের সকল প্রসঙ্গে বিচারিত। প্রথম কবিতা ‘উটপাখি’তেই ফুটে বের হলো অস্তিত্বের সর্বনাশ। কবির কালচেতনা, ঈশ্বরচেতনা, মৃত্যুচেতনার জন্মভূমি ক্রন্দসী। কবির চেতনারাশির অনন্য অন্তিম ফল নাস্তি। ‘কাল’, ‘লঘিমা’, ‘ভাগ্যগণনা’ ইত্যাদি কবিতায় কালচেতনা স্পষ্ট। মহাকাল স্মৃতিকেও ক্ষমা করে না। কবি ‘মিছে এ মিনতি’ করছেন যাতে কালের হাত থেকে রক্ষা পায় -

‘সর্বস্বান্ত কৃপণের শেষ সঞ্চয়ন
ওই কটা মূল্যহীন, নিরানন্দ, কণ্টকিত স্মৃতি।’

- যার ফলে অনিবার্য ভাবে -

"নাস্তি গর্ভ প্রাক্তন তিমিরে
আমার স্বতন্ত্র সত্তা হতে থাকে ক্রমাগত ক্ষয়;
ফুরায় ইন্দ্রিয়বোধ; মূক হয় বাচাল হৃদয়;
শুধু শ্রুতি জেগে রহে। মহামৌনে শুনি অকস্মাৎ
বিনষ্ট বিশ্বের প্রান্তে কোথা যেন কালের প্রপাত

উল্লম্ফন রভসে নামে অনন্তের উন্মুদ্র অতলে।
কণিকাও নহি আমি; চরাচর লুপ্ত সে-কল্লোলে।" (‘লঘিমা’, ক্রন্দসী)।

-ঈশ্বরচেতনা মূর্ত হলো ‘প্রশ্ন’, ‘প্রার্থনা’ ইত্যাদি কবিতায় -
"ভগবান ভগবান, রিক্ত নাম তুমি কি কেবলই?
নেই তুমি যথার্থ কি নেই?
তুমি কি সত্যই
আরণ্যিক নির্বোধের ভ্রান্ত দুঃস্বপ্ন।"(‘প্রশ্ন’, ক্রন্দসী)

-মৃত্যু সম্পর্কে কবি বলেন –
"মৃত্যুর সৈকতে
মহত্ত্ব কল্পনা মাত্র। বল্মীকের সাম্যময় স্তূপে
নির্লিপ্ত নির্বাণ, শান্তি কেবলই স্বপন।"(‘মৃত্যু’, ক্রন্দসী)

-‘সৃষ্টির রহস্য’ কবিতাতেও কবির দার্শনিক প্রতীতি বাঙ্ময় -
"কপোল কল্পনা ত্যাগ, নিরাসক্তি অসাধ্য সাধন;
অনন্ত প্রস্থান মিথ্যা; সত্য শুধু আত্মপরিক্রমা;
বিদ্রোহে স্বতন্ত্র্য নাই; মুক্তি মানে নিরুপায় ক্ষমা;
সৃষ্টির রহস্য মাত্র আলিঙ্গন, পুনরালিঙ্গন।"

"উত্তর ফাল্গুনী" ১৯৪০ সালে প্রকাশিত। এটা 'ক্রন্দসী'র পরিপূরক কাব্যগ্রন্থ। এখানে প্রেম ফিরে এলো বহুস্তর আধুনিকতায় ভরপুর উৎসুক ও গভীর হয়ে। এখানে সাধারণী প্রেমিকার মধ্যে জেগে ওঠে চিরন্তনী। তখন কবির ক্ষমাহীন মৌল জিজ্ঞাসা,-
‘ভালো কি তবে বেসেছি তারে আমি
বিজ্ঞ হিয়া শিহরে তাই ভয়ে?’

-ওই জাগর চৈতন্যই কবিকে ঘুমের ভেতরেও নিদ্রাহীন করে দিয়ে যায়। ‘প্রতিদানে’ প্রেমের আশা-নিরাশা উভয়ই আছে :
"আমার মনের আদিম আঁধারে
বাস করে প্রেত কাতারে কাতারে
প্রাকপুরাণিক বিকট পশুর
দায় ভাগ মোর শোনিতে নাচে।" (‘প্রতিদান’, উত্তর ফাল্গুনী)

-‘ব্যবধান’, ‘অহৈতুকী’, ‘নিরুক্তি’ ইত্যাদি কবিতায় প্রায় অনুরূপ মনোভাব ঘোরাফেরা করে। কিন্তু ‘প্রতিপদ’ কবিতায় ‘আত্মহারা স্বয়ং সবিতা’।

অনেকের মতে শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ '**সংবর্ত**' প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে। কাব্যের মুখবন্ধে কবি লিখেছেন –

‘মালার্মে প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট। আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ; এবং উপস্থিত রচনাসমূহ শব্দ প্রয়োগের পরীক্ষা রূপেই বিবেচ্য।’

-সংবর্তে প্রবেশ করল তপ্ত ও স্পন্দিত সমকাল তাঁর ভাস্কর্যের অবয়বে। এখানে প্রেয়সী, প্রকৃতি ও রাজনীতি একাকার হয়েছে – এলোমেলো জীবনের বিন্যাসে নির্মাণে, পুনর্বিন্যাসে পুনর্নির্মাণে। ‘নান্দীমুখ’ কবিতায় তার উদ্বোধন, বিন্যাস ‘উপসংহার’ কবিতায় :
"হেথা নাস্তি পৃষ্ঠে, পুরো ভাগে :
মাঝে শুধু তুমি, আমি আর এ আদিম অরণ্যানি;
সমাধিনিমগ্নকাল, অসম্ভূত অমা একা জাগে,
পরাহত লুব্ধ কানাকানি।" (‘উপসংহার’, সংবর্ত)

-এখানে ওই ‘অরণ্য’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনায় উন্মুক্ত আতিশয্যের নগর সভ্যতা। যাতে দেখা যায় – ‘নিরঙ্কুশ, নিঃসন্তান নিত্য মরুভূমি আসিত্মকের পুরস্কার’, তরণী শতচ্ছিদ্র; কাস্তে হলো চাঁদ; অরাজক চরাচরে প্রশ্ন প্রতিহিংসার প্রতুল এবং ‘জঘন্য চক্রান্তে লিপ্ত অতীন্দ্রিয় ভাবনানিচয়’। আধুনিক যুগের স্বাক্ষর মুদ্রিত এর পাতায় পাতায় :
‘আসন্ন প্রলয়

মৃত্যু ভয়
নিতান্তই তুচ্ছ তার কাছে।
সর্বস্ব ঘুচিয়ে যারা ব্যবচ্ছিন্ন দেহে আজ বাঁচে
একমাত্র মুমূর্ষাই তাদের নির্ভর:’ (‘উজ্জীবন’, সংবর্ত)।

-তবু ক্রন্দসীর প্রার্থনা কবিতায় যেমন অন্তিমযাত্রার পরে সুরসুন্দরীর সান্নিধ্যের আশা করছেন, তেমনি সংবর্ত কাব্যের ‘সংবর্ত’ কবিতায় ‘স্বপ্নের নিভৃতে’ ‘ন্যায়, ক্ষমা, মিতালি মনীষা’-ভরা এক রাষ্ট্র ছিল,-

'শ্বাপদসংকুল নয় যেখানে কানন,
দূরাক্রম্য নয় গিরি চূড়া
পরিস্রুত সুরা
নিদাঘের অফুরন্ত দিন।’

সুধীন্দ্রনাথের কোনো কাব্যই পরিপূর্ণ নিরাশ্বাস নাসিত্মর সমর্থন করে না। প্রতিটি কাব্যেই অতল শূন্যের মধ্য থেকে মাঝে মাঝে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে স্বর্গের চাবিরগুচ্ছ। তন্বী তো রবীন্দ্র অনুকরণে রচিত। তার উল্লেখ না করলেও চলে। অর্কেস্ট্রায় ‘মূর্তিপূজা’, ‘পুনর্জন্ম’, ‘অনুষঙ্গ’, ‘মহাশ্বেতা’ ও সর্বোপরি উত্তুঙ্গ ‘শাশ্বতী’ কবিতায় স্বর্গের চাবি চোখের সামনে টুংটাং শব্দে নড়াচড়া করে। ক্রন্দসীর প্রার্থনায় :

"আমার অন্তিম যাত্রা অতিক্রমী সুমেরুর বাধা
হয় যেন নন্দনে সমাধা,
সেখানে প্রতীক্ষারত সুরসুন্দরীরা
সুকৃতির পুরস্কারে পাত্রে ঢেলে অমৃত মদিরা,
নীবিবন্ধ খুলে,
শুয়ে আছে স্বপ্নাবিষ্ট কল্পতরু মূলে।"(‘প্রার্থনা’, ক্রন্দসী)

-উত্তর ফাল্গুনী থেকে এ-ধরনের আশাবাদী কবিতা হচ্ছে – ‘প্রতিদান’, ‘অননুতপ্ত’, ‘প্রশ্ন’, ‘জন্মান্তর’, ‘মাধবী পূর্ণিমা’, ‘ডাক’ প্রভৃতি। সংবর্ত কাব্যগ্রন্থের ‘বিপ্রলাপ’ কবিতায় কবির জড়বাদ মূল্য সন্ধানে অসমর্থ হয়ে যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেও তার পরিণতিতে আশাবাদেরই সুর ধ্বনিত :

"হয়তো ঈশ্বর নাই : স্বৈর সৃষ্টি আজন্ম অনাথ;
কালের অব্যক্ত বৃদ্ধি শৃঙ্খলার অভিব্যক্ত হ্রাসে;
বিয়োগান্ত ত্রিভূবন বিবিক্তির বোমারু বিলাসে;
জঙ্গমের সহবাসে বৈকালের দুঃস্থ সন্নিপাত’ কিন্তু অবশেষে
অচিরাৎ বিপ্রলাপে ডুবে মরে স্বাগত সন্তাপ :
আমার শাস্তিতে, মানি, ক্ষান্ত তার অবরোহী পাপ।(‘বিপ্রলাপ’, সংবর্ত)

-তার ভাব ও চিন্তার অনুকূল বিচিত্র ধ্বনি নির্মাণের জন্য এবং শব্দের যুক্তিসহ সুশৃঙ্খল বিন্যাসের জন্য অচলিত সংস্কৃত শব্দ তাকে সন্ধান করতে হয়েছে। অলস পাঠকের জন্য তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য। তাঁর ব্যবহৃত প্রচলিত শব্দের মধ্যেও যে নতুন অর্থ-দ্যোতনা আছে তা বিস্ময়কর, ব্যাপক ও গভীর।

সুধীন্দ্রনাথের কবিতা দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ। অভিধানের সাহায্যে সেই দুরূহতা অতিক্রম করা সহজ। ইতোমধ্যে তাঁর প্রবর্তিত বহু শব্দ লেখক ও পাঠক সমাজে প্রচলিত। ‘অন্বিষ্ট’, ‘অভিদা’, ‘ঐতিহ্য’, ‘প্রমা’, ‘প্রতিভাস’, ‘অবৈকল্য’, ‘ব্যক্তিস্বরূপ’, ‘বহিরাশ্রয়’, ‘কলাকৈবল্য’ প্রভৃতি শব্দ ও শব্দবন্ধের প্রথম ব্যবহার সুধীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধে। ‘ক্লাসিক্যাল’ অর্থে ‘ধ্রুপদী’ শব্দটিও তাঁরই উদ্ভাবনা। ইংরেজি সাহিত্যে উচ্চশিক্ষেত হলেও একটিও ইংরেজি শব্দ ব্যবহার না করে এবং অগত্যা চিন্তাকে তরল না করে কবিতাকে তিনি দিয়েছেন এমন এক শ্রবণ-সুভোগ সংহতি ও গাম্ভীর্য, যাকে বাংলা ভাষায় অপূর্ব না বলে উপায় নেই। একমাত্র তাঁর কাব্যভাষা বিশ্বের যে-কোনো অভিজাত বিদেশি ভাষার সঙ্গে সমমর্যাদায় আসীন হতে সমর্থ। সবচেয়ে বড় কথা, সুধীন দত্তের নিখিল নাস্তি চেতনার অন্তরালে শুদ্ধতম আসিত্মক সত্যের অনুসন্ধান, নৈরাশ্যবাদের অন্তরালে বৈদগ্ধ্য আশাবাদ বিস্ময়কর।

সৌম্য, যুক্তিবান, প্রাজ্ঞ ও সযত্ন শিল্পী সুধীন্দ্রনাথ একালের ভাষারহস্যের মহাকবি। এ-প্রসঙ্গে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের মন্তব্য যথার্থ – ‘শিথিল ও অতিভাষী বাংলা ভাষাকে সুধীন্দ্রনাথ দান করেন নির্মেদ ও নির্বহুল এক টানটান ছিলার সংহতি।’ তিনি অভিজাত বাংলা কাব্যভাষায় সব রাজার ওপরে রাজর্ষি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য নগরকেন্দ্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার অভিঘাতে জর্জরিত। তিনি আপন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য নিয়ে

নতুনত্বের সন্ধানী। তাঁর কাব্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক নারকীয় মনোভাব ভনভন করে ঘোরে, টানটান করে রাখে একই মানদণ্ড। বাংলা কাব্যে তিনি নৈরাশ্যবাদের আত্মার সন্তান। তাঁর কাব্যাদর্শে অন্বিষ্ট ধ্রুপদী শিল্পীর নিষ্ঠা, প্রতীকী কবিদের স্বল্পভাষ ব্যঞ্জনাধর্মী সংহতি, ইন্দ্রিয়ঘনত্ব, নৈর্ব্যক্তিকতা, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায়। সুধীন দত্ত জড়বাদী ও ক্ষণবাদী দর্শনের অভিব্যক্তির অন্তরালে আধুনিক দার্ঢ্য, অভিজাত কাব্যভাষার উদ্ভাবক। স্বদেশ-বিদেশের কোনো কোনো কবির সঙ্গে কাব্য নির্মাণে ও কাব্যভাষায় সংযুক্ত হলেও তিনি সেসব কবির আপাত ও লুকানো প্রভাব ছাড়িয়ে আপন মৌলিকতাকে করেছেন সুস্পষ্ট। এখানেই তিনি স্বতন্ত্র, একাকী ও উত্তর সাধকের বিস্ময়স্থল। 'কবি' শব্দের প্রতিটি অর্থ সুধীন্দ্রনাথের জীবন ও রচনায় প্রমূর্ত।

গ্রন্থসূত্র

১. কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু।

২. আধুনিকতা ও রবীন্দ্রনাথ, আবু সয়ীদ আইয়ুব।

৩. আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দীপ্তি ত্রিপাঠী।

৪. দশদিগন্তের দ্রষ্টা, আবদুল মান্নান সৈয়দ।

৫. সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কাব্য সংগ্রহ, দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : কমরুদ্দিন আহমদ